International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 46-51
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.46-51

রবীন্দ্রনাটকে যাত্রাগান: বিষয় ও বিন্যাস

ড. স্বর্ণকমল গোস্বামী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email- skgoswami755@gmail.com

Abstract:

Yatra has a sincere yoga formula with the common life of village Bengal. Due to the need of the age or the urge of modernity, the journey has undergone a radical transformation. Various crises and complications of life, conflict or tension are captured by the artist's pen on the canvas of imaginary characters or stories. Social characters get language behind dramatic conflicts or dramatic complications in a clear mirror like a play. Rabindranath's iconic dramas are a mixed repertoire of these elements. 'Raja', 'Achalayatan', 'Raktakaravi', 'Muktdhara' in these stage successful dramas, the aspect of journey has come in different ways at different times. In the present essay, we take a close look at how Rabindranath's allegorical dramas, especially the technique, application and relevance of the Yatra song and the use of songs in stage productions.

Keywords: Rupak-sanketik, ballo gan, Tolon-naman, picture, frame, jatra, panchali, duet gaan.

যাত্রা বাঙালির এবং বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যকলা। এই যাত্রা থেকেই ‘আঁচলা ভরে তেষ্টা’--- রসের তেষ্টা মিটিয়েছে বাংলার অগণিত মানুষ,বাংলার প্রায় সব রকমের মানুষ। এ জন্যই যাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসেছিলেন বাল্যকাল থেকেই। যাত্রার সুর, এর নাচ,এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ও মাঠ-ঘাটের পয়দা করা।১ রবীন্দ্রনাট্যকলায় বিশেষত রূপক-সাংকেতিক নাটক গুলির দেহে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যাত্রার সুর, যাত্রার বিশেষত্ব। তবে একথা সত্য এবং স্বীকার্য যে,যাত্রার শিল্পপ্রকরণ রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের মত করে গড়ে নিয়েছেন।

রূপক সাংকেতিক নাটকগুলি রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এইসব নাটকে তিনি যাত্রার আঙ্গিককে মাঝে মাঝে গ্রহণ করেছে। আসলে, আধুনিক জীবনের জটিলতা, যুগসংকট প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক রঙ্গমঞ্চের যান্ত্রিক অনুবর্তন সমর্থন করেননি; তিনি যাত্রার আঙ্গিককেই তাঁর নাট্য বিষয়ের উপস্থাপনার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। মায়াকোভস্কি ঠিক যেমন রুশ লোকনাট্যের আঙ্গিককে গ্রহণ করেছিলেন,স্বকীয় সৃষ্টিতে। নাটকে যাত্রাগানের বিন্যাস বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমতটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়: ‘বাস্তবিকই যাত্রাকে বাঙালির জাতীয় নাট্যকলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যাত্রাকে পাশ্চাত্য

নাটকাবলীর ঘটনামূলক ক্রিয়ার গতিভঙ্গি দ্বারা বিচার করিলে চলিবে না। পাশ্চাত্যের কথাসাহিত্যে বা নাটকের আদর্শ ঘটনাবহুল ক্রিয়া---আমাদের সাহিত্যে ঘটনা অপেক্ষা রসের প্রাধান্য।আমাদের যাত্রার নাট্যকার ও অভিনেতার মুখ্য দৃষ্টি থাকে রসসৃষ্টিতে।'২

এই জাতীয় নাট্যকলা যাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বারংবার। যাত্রার প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের সুগভীর অনুরাগটি ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনীসাহিত্য গুলিতে।৩ 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ যাত্রার শিল্পরীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন: 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইয়া থাকে।সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোন কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।'৪ এই প্রবন্ধেই তিনি আবার যাত্রার দৃশ্যপটহীনতার প্রশংসা করে বলেছেন: 'আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভালো লাগে।যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নেই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেটাই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।'

দর্শকদের সঙ্গে এই আত্মিকতার উপর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : 'এই যে দর্শকদের সঙ্গে বোঝাবুঝি 'Taking the audience into confidence'এইটে যাত্রাতে সম্ভব হয় তার কারণ, আসরের মধ্যে একেবারে দর্শকের কাছে ঘেঁষে তাঁদের স্থান, দর্শকের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন নন।'৫

আবার গ্রামীন নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুলক্ রাজ আনন্দ্ বলেছেন : "the players and the audience are one, forming a Unity throw the circles in which they sit around the improvised booth of the stage while the actors walkup, to and form the dressing room through the clearing which the audience obligingly affords as and when necessary."৬ সুতরাং যাত্রাগানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে উপরোক্ত ত্রয়ী নাট্য বিশারদ তথা নাট্য-আলোচকদের কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিন্ন বলেই স্বীকৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথের রূপক: সাংকেতিক নাটকগুলিতে সাধারণ নাটকের মত অংক দৃশ্য বিন্যাস নেই, স্থুল ঘটনাও তিনি ঘটাননি। 'রাজা' নাটকে রয়েছে কুড়িটি দৃশ্য, 'ডাকঘর' নাটকে তিনটি, 'অচলায়তন' এ ছয়টি,এবং 'তাসের দেশ'-এ চারটি মাত্র। এদিকে যাত্রার বিন্যাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের মিল আছে। যাত্রা গানের শিথিল দৃশ্যবিন্যাস যখন কঠিন হল অর্থাৎ অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, দৃশ্যের বন্ধন দৃঢ় হল তখন যাত্রাগান পরিণত হল যাত্রাভিনয়ে। যাত্রা গানের ঢিলেঢালা দৃশ্যবিন্যাস রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য নাটকগুলিতে লক্ষ করা যায়।

যাত্রাগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গানের প্রাবল্য। যাত্রার সঙ্গে গান শব্দটির সংযোজন এই বৈশিষ্ট্যেরই ইঙ্গিত দেয়। সহজভাবে বলা চলে, যাত্রা যেন সংগীতমনস্ক, আবার সে সংগীতমগ্নও বটে। সঙ্গীত, যাত্রায় অনেক সময় অনিবার্য নয়, আরোপিত। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাট্যে গান প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য, আরোপিত নয়। তাই যাত্রা গানের সঙ্গে একদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের রূপক- সাংকেতিক নাটকের প্রয়োগগত পার্থক্য আছে। আবার মূলত উভয় ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যও আছে।

সংলাপ শেষে সংলাপের সূত্র ধরে গান রচনা করা যাত্রার একটি বিশেষ রীতি। এই রীতিকে সংলাপী গান বা উক্তিগীতি বলা চলে।এ ধরনের গানকে সংলাপের ব্যাখ্যা-সূত্র বলেও ধরা চলে। রবীন্দ্রনাট্যে এমন ধরনের অনেক গান আছে। 'রাজা' নাটকে ঠাকুরদা যখন বলে, 'হ্যাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে।' 'এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যে গান তা হল: 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।'

কিংবা, 'তার কাছে ধরা দিলে ধরা দেওয়াও যা, ছাড়া পাওয়াও তা' ---- এর সঙ্গে রয়েছে গান : 'যে জন দেয় না দেখা, যায় না দেখে।' 'অচলায়তন' নাটকে পঞ্চকের সংলাপী গানটির কথা এই সূত্রে উল্লেখ্য-- 'ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো--আজ যেমন করে গাইছে আকাশ।' 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয়ের সেই সংলাপী গানটির কথাও এই সূত্রে বিবেচ্য : 'খ্যাপাই বৈকি, নিজেও খেপি---আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে।' 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনী সংলাপের সঙ্গে গান গেয়েছে, তার পৌষের গান।ফসল পেকেছে কাটতে হবে, সেই ফসল কাটার গান। আর তারই ডাক: 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে...।' 'তাসের দেশ' নাটকেও হরতনী সংলাপের শেষ গান ধরেছে: '..সেই জন্মের মাধবী বন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে।' সুরেলা কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি-- 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।'

যাত্রায় চরিত্র যেমন সংলাপের শেষ অংশের সূত্র ধরে গান গায়, তেমনি কোনো বক্তব্য বা ভাব সংলাপের এক অংশে এবং গানে অপর অংশ টিকে প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে চরিত্রের বক্তব্য বা ভাব যেন আধাআধি ভাগ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে এমনতর গানের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। তার একটি উদাহরণ, ঠাকুরদা যখন বলে:'এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানা ক্ষেত্রে নানারকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হয়ে উঠেছিল-- রণক্ষেত্রেও মন্দ জমেনি। সে তো চুক, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর্ তোরে ভাই, তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর্'—

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবন,
করো না বিড়ম্বিত তারে।'

'মুক্তধারা' নাটকের ধনঞ্জয় বলে:'যিনি সব দেন তিনিই সব রাখে। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিকবে না।' সংলাপের এই বক্তব্য গানের সুরে রূপান্তরিত হয়:

'যা-খুশি তাই করতে পার,
গায়ের জোরে রাখ মার
যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা সন সেটাই সবে।'

আবার, 'রাজা ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগত তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও মুঠোর মধ্যে, চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।'---

'ভাবছ হবে তুমি যা চাও

জগৎটাকে তুমিই নাচাও
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয়না যেটা সেটাও হবে।’

যাত্রায় বিবেকের গান, বালকের গান, ডুয়েট গান, পালাগান, ব্যালো গান প্রভৃতি নানা জাতের গানের প্রয়োগ আছে। এ ধরনের গানের মূল উদ্দেশ্য অভিনয়ের মাঝখানে স্বস্তি আনা, নিছক প্রমোদ করা। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক গুলিতে যেসব গানের প্রয়োগ আছে সেই সব গান যাত্রা গানের প্রমোদ ভাবনা থেকে পৃথক। মূলত নাটকের ধারাবাহিকতা রক্ষায় এসব গান এসেছে। ‘শারদোৎসব’ নাটকে বালকগণ কে গাইতে শুনিঃ ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে...’। ঠাকুরদা ও বালকেরা বাউলের সুরে গেয়েছে গানঃ ‘আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়।’ ‘মুক্তধারা’ নাটকে ভৈরব পন্থীদের আটটি গান এবং উত্তরকূটের নাগরিকরা যন্ত্রের মহিমা নিয়ে একটি গান গেয়েছে। ’তাসের দেশ’ নাটকে তাসের দল ‘তোলোন- নামোন’ গান গেয়েছে। যাত্রার সমবেত গানের প্যাটার্ন কিছুটা রবীন্দ্রনাথের এসব নাটকে খুঁজে পাওয়া যায়।

যাত্রায় সাধারণত একটা বিবেক চরিত্র থাকে। এই চরিত্রটি যেন নাট্যঘটনার নিয়ন্ত্রক এবং নাটকের দ্রষ্টা। নাটকের সব কিছুই তাঁর জানা থাকে, আবার সে’ই চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে। নাট্য চরিত্রের ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায় ও অনৈতিকতা ও নীতিবোধ কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে সে পথ নির্দেশনা দেয়। তবুও মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে সে সম্পৃক্ত নয় বরং অনেকটাই নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন। এ জাতের বিবেক চরিত্র মূলত গায়ক।মাঝে মাঝে সংলাপে যোগ দেয়।রবীন্দ্রনাথের রূপক- সাংকেতিক নাটকে ঠাকুরদা জাতীয় চরিত্র আছে। ‘শারদোৎসব’-এ ঠাকুরদা তাই নাটকের মূল তত্ত্ব জানে ও প্রকাশ করে। ‘রাজা’ নাটকের সুদর্শনা রাজা সম্পর্কে ঠাকুরদাকে বলে: ‘ঠাকুরদা এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কি করে।

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে সুখের দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি -- এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বৈকি--- নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন! ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে।’

আসলে, ‘রাজা’ নাটকে সুদর্শনা রাজাকে প্রথমে বুঝতে পারেনি; কিন্তু ঠাকুরদা রাজার বন্ধু,--- রাজা চরিত্রের এবং রাজাতত্ত্বের সে’ই ভাষ্যকার। সুদর্শনা অবশেষে রাজাকে চিনেছে ঠাকুরদার সাহায্য নিয়ে। তাই ‘রাজা’ নাটকের রাজা তত্ত্বটি নাটকের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে চরিত্রটি সংযুক্ত। কিন্তু যাত্রাগানের বিবেক চরিত্র নাট্য ঘটনার সঙ্গে এতটা যুক্ত হতে পারেনা; তাই যাত্রা গানের বিবেক চরিত্র আর রবীন্দ্র নাটকের ঠাকুরদা জাতীয় চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় থাকে।

‘ডাকঘর’ নাটকে মৃত্যুপথযাত্রী অমলের সুদূরের আর্তিমোচনে, আত্মিক সংকট সমাধানে, অরূপকে জানতে সাহায্যকারী হিসেবে অর্থাৎ এককথায়, অমল চরিত্রের পূর্ণায়ণে ঠাকুরদা প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য। ‘অচলায়তন’ নাটকে গুরু চরিত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ দাদাঠাকুর, ‘মুক্তধারা’ নাটকে অভিজিৎ চরিত্রের ব্যাখ্যাতা হিসেবে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটিও অপরিহার্য।

যাত্রা রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত আকর্ষণ করেছে এই জন্য যে,যাত্রার দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। আবার দৃশ্যপটহীনতা যাত্রার মূল উপজীব্য। উপরন্তু যাত্রামঞ্চের চারদিক খোলা এমনকি

সাজঘর থেকে মঞ্চে আসার পথটুকুতেও কোন আড়াল নেই। দর্শকদের মধ্য থেকে অভিনেতা উঠে আসলেও কোন বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি বিশেষত ‘শারদোৎসব’, ‘ফাল্গুনী’ এবং ‘মুক্তধারা’র অভিনয় কোন সাজানো-গোছানো-বাঘরা মঞ্চে কঠিন কাজ এসব নাটকের জন্য প্রয়োজন মুক্ত মঞ্চ। মাঠ ঘাট প্রকৃতির অনাবৃত বিস্তৃতি এসব নাটকের দৃশ্য পঞ্চের খন্ড খন্ড দৃশ্যপটে নাটক অভিনয় কৃত্রিমভাবে পড়বে বিস্তারিত প্রকৃতির বিস্তৃত দৃশ্যান্তর চলে যায় মুক্তধারা দৃষ্টান্ত চলে যায় এই নাটকের দৃশ্যে অভিনয় টেনে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে অভিজিৎ বলেছে, ‘যেসব পথ এখনো কাটা হয়নি ওই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি, দূরকে নিকট করবার পর এইদৃশ্যকে কোন রেখা-চিত্রকর প্রকাশ করতে পারে না। এই কাজের ভার ছেড়ে দিতে হয় ভাবুক চিত্তে কল্পনার উপর। আর এটা যাত্রার শিল্পকলা ও আঙ্গিকে পাওয়া যায়। আসলে, দৃশ্যপট রবীন্দ্রনাথের কাছে এই অর্থেই উপদ্রব, সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।

আবার ‘মুক্তধারা’, ‘রক্তকরবী’র মতো নাটকগুলি যন্ত্রলালিত সভ্যতার সংকট,যন্ত্র ও প্রাণের সংঘর্ষ, যন্ত্র ও শক্তির নভোচুম্বি আস্ফালন ও স্পর্ধার মধ্যে শূন্যতাকে প্রকাশ করে। এসব নাটকে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যাত্রা থেকে গৃহীত শিল্পকলা এবং আঙ্গিকেও নির্বিশেষ নিরাবয়ব ভাব যথার্থ পরিস্ফুট হয় না, আর তাই রবীন্দ্রনাথকে নতুনতর কলা-কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে যা নির্দিষ্ট সীমায় 'Picture Frame' কে ভাঙতে সক্ষম। ডক্টর বিষ্ণু বসু তাঁর গবেষণায় এমন কথা বলতে চেয়েছেন এবং তিনি ‘মুক্তধারা’, ’রক্ত করবী’ নাটক দুটিকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করে দেখিয়েছেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথ তার নাটকের এই 'Picture Frame' ভেঙ্গেছিলেন:

‘মুক্তধারা নাটকের শুরুতেই মঞ্চ নির্দেশ। উত্তরকূটের পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তর ভৈরব মন্দির যাইবার পথ! দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহ যন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূল।‘এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিভাত হচ্ছে যে, একটি স্থিতিশীল মঞ্চ যা 'Picture Frame' এর দ্যোতক।কিন্তু এই স্থিতিশীলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছেন এমন এক জঙ্গমতা যা ’মুক্তধারা’র প্রতীক। নাটকের পর্দা একবারই সরছে অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্যে এমন কতগুলো দৃশ্য পরিকল্পনার আভাস আছে যা কখনোই দর্শকের সম্মুখস্থিত দৃষ্টিসীমার পথটুকুতে আবদ্ধ নয়। আবার শুধু যে ভৈরবপন্থীদের গীত সহ প্রবেশ ও প্রস্থানে উত্তরকূটের দীর্ঘ পথপরিক্রমা সূচিত হয়েছে এমনটা নয়;অম্বাও বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের প্রয়োজনীয় মঞ্চারণা একসঙ্গে যেন বহু স্থান ও কাল গ্রথিত করে দিয়েছে। একটি মঞ্চস্থাপত্য বজায় রেখে নাটকে বিভিন্ন তল (plane) উপস্থাপনা করা 'picture frame' না ভাঙলে সম্ভব হত না। ‘মুক্তধারা’য় যার প্রস্তাবনা, ‘রক্তকরবী’তে তারই সার্থকতর প্রয়োগ।’রক্তকরবী’র সূচনায় মঞ্চ নির্দেশ:‘এই নাট্য ব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী।এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।’ অর্থাৎ এখানেও মঞ্চে উপস্থাপিত একটিমাত্র দৃশ্য ও জালের আবরণ নির্দিষ্ট পশ্চাৎপট রূপে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু নাটকের গতিশীলতা কখনোই দর্শকের দৃষ্টিসীমায় স্থান ও কালে সংকুচিত নয়। কখনো সন্ধ্যা,কখনো সকাল, কোথাও রাজদ্বার, কোথাও বা শ্রমিক কিম্বা বসতি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান ও কাল অত্যন্ত সাবলীল সঞ্চরণে উপস্থিত হয়েছে নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য এবং সে দৃশ্যটিও নাট্যকার দ্বারা সুস্থির মঞ্চলক্ষণে চিহ্নিত। থিয়েটারের 'picture frame' ভেঙ্গে যাত্রার সাবলীলতা এভাবেই রবীন্দ্রনাথ আনতে

চেয়েছিলেন নাটকে। তাই তর কাছে যাত্রা একটি জৈবিক প্রেরণা এবং এভাবেই যাত্রার 'Form' বা আঙ্গিক হয়ে উঠেছে আধুনিক ও যুগোপযোগী।'৭

'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে সরাসরি যাত্রার প্রসঙ্গও আছে। 'মুক্তধারা'য় পথিকদের দৃশ্য এই নাটকে ঘুরে ঘুরে এসেছে। পথিক যেন যাত্রাদলের গায়ক, যাত্রার চরিত্র তারা।একজন জনৈক পথিককে বলতে শুনি: 'আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল? 'রক্তকরবী'র নন্দিনী নেপথ্যচারী রাজার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে বলে: 'লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে--- সে যখন আমাদের আসরে নামে তখন ছেলেরা আতকে উঠলে সে ভারি খুশি হয়। তোমারও যে সেই দশা।'

শুধু যে যাত্রার প্যাটার্ন রবীন্দ্রনাটকে আছে তা নয়, নাটকের চরিত্রও যাত্রার স্মৃতিচারণা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটক গুলিতে লোকনাট্যের বিশেষত যাত্রার কাঠামো নিয়েছেন। পাঁচালীর কিছু কিছু প্যাটার্নও আছে তাঁর নাটকে। লোকায়ত জীবনের ছবি তাঁর নাটকে প্রায়ই ঘুরেফিরে আসে নানা ভাবে।ব্রতের রীতিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যের গঠনে সঞ্চারিত করেছেন কখনো কখনো। আসলে মাঠ-ঘাট-বাট, বন-প্রান্তর প্রভৃতির সমুন্নোতি ও প্রকৃতির ছড়ানো পটভূমিকায় লোকজীবনকে স্পর্শ করার যোগ্য মাধ্যম হল এই যাত্রা,পাঁচালী ও ব্রত।আর এই নান্দনিক উপলব্ধিটি মাত্রায়িত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র ভাষ্যে :
'সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে ক্রোশ দু-ক্রোশ অন্তর বালিখুঁড়ে জল তোলা। ঘন্টা কয়েক তার মেয়াদ। পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁচলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।'৮

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা',রবীন্দ্র রচনাবলী,ষড়বিংশ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ,১৩৫৫, পৃষ্ঠা-২৭-২৮
২. কুমুদবন্ধু সেন, 'গিরিশচন্দ্র',পৃষ্ঠা-৫৪
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা',রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ,১৩৫৫, পৃষ্ঠা-৩০
৪. দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্ররচনাবলী'সপ্তদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ১৩৪৭
৫. মনি বাগচী, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার(জিজ্ঞাসা), পৃষ্ঠা-৩৭১
৬. The Indian Theatre, p.12.
৭. চিত্তরঞ্জন লাহা, বাংলা নাটকের টেকনিক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা,পৃষ্ঠা-৪৫
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', রবীন্দ্ররচনাবলী, ষড়বিংশ খন্ড, পৌষ ১৩৫৫,পৃষ্ঠা-৭৪-৭৭.